Vol. 9 | No. 2 | 1965

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)

Volume	9
Issue	2
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Ahmed Sharif
Published online	December 16, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i2.6
Pages	177-195
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

॥ গ্রন্থ পরিচয় ॥

মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭—১৯১৮) : ডক্টর আনিসুজ্জামান। ১ম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৭১ সন। ১২ + ৫২৬ = ৫৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আট টাকা। লেখক সংঘ প্রকাশনী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের গবেষণাগ্রন্থ।

সাম্প্রতিক কালে যে-কয়টি বাংলা Doctoral thesis বের হয়েছে, সে সবের মধ্যে ডক্টর আনিসুজ্জামানের গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। এ এমন একটি বই যা একবার পড়ে ফেলে রাখবার মতো নয়, বারবার পড়ার প্রয়োজন এবং প্রতি বারেই নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বের উদ্ভাস ঘটে এবং চিন্তার উদ্দীপন হয়। সব ভাল গ্রন্থই অভিনব চিন্তার খোরাক যোগায় আর তৃপ্তি দেয়, এটি তেমন একটি বই।

লেখকের লক্ষ্য ছিল 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম-অবদানের ধারা অনুসরণ করে লেখকদের চিন্তাধারার পরিচয়দান।' (পৃঃ দুই) এ সূত্রে "সামাজিক পশ্চাৎপটের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ আমলের (১৭৫৭-১৯১৮) বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যকর্মের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত-লেখকদের সৃষ্ট সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ের প্রয়াসও" রয়েছে। (পৃঃ দুই)। তবু লেখক বলছেন, "কিন্তু এটি সাহিত্যের ইতিহাস নয়, সাহিত্য-সমালোচনাও নয়,"—উক্তির এ আপাত-বিরোধ লেখকের বিনয়প্রসূত।

আসলে সমাজ-প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক আঠারো-উনিশ-বিশ শতকের (১৭৫৭-১৯১৮) বাঙালী মুসলমানের জীবন, সমাজ ও মননের ধারা অনুসরণের প্রয়াসী ছিলেন। তিনি তাদের জীবনচর্যার আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং মননের গতি-প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন এ গ্রন্থে।

সমাজ-প্রতিবেশ নিরূপণ-প্রয়াসে লেখক চার পর্বে বিশ্লেষণ করেছেন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক ও আর্থনীতিক অবস্থা,

এ সূত্রে তথ্য-সমৃদ্ধ নানা নতুন কথাও শুনিয়েছেন লেখক, এবং দু'চারটে তত্ত্বও মিলেছে সে প্রসঙ্গে।

মানুষের কোনো মত বা সিদ্ধান্তই তর্কাতীত নয়। বোধ-বুদ্ধি ও দৃষ্টির পার্থক্য স্বীকার করেই কোনো বক্তব্য ও মতের সামগ্রিক ও যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব। মানুষের অনবরত প্রয়াস হচ্ছে সঞ্চিত উপকরণ ও তথ্যের সাহায্যে সত্যের প্রকটন ও তত্ত্বে উত্তরণ। নতুন মানুষের স্বকীয় রুচি বুদ্ধি ও দৃষ্টি নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করবে—এটিই গবেষণার প্রথম শর্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় প্রেরণার এটিই উৎস এবং এ ব্রতের প্রথম ও প্রধান অঙ্গীকার।

লেখক-পরিব্যক্ত কয়েকটি মত সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য রয়েছে। সেগুলো এখানে বলে রাখি :

ক. আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইংরেজী শিক্ষার ফসল। প্রথম পর্যায়ে মুসলমানরা ইংরেজী-শিক্ষা গ্রহণে ছিল উদাসীন। তাই উনিশ শতকের প্রথম সত্তর বছর আধুনিক সাহিত্যাঙ্গনে তারা অনুপস্থিত। এখানে তাদের সঞ্চরণ শুরু হয় মীর মুশারফ হোসেনের নেতৃত্বে। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম পাদের আগে যারা লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা ছিল সার্থক সৃষ্টির অন্তরায়, স্বাধীন চিন্তার প্রতিকূল। এমনি অবস্থায় গোঁড়ামীই হয় আত্মরক্ষার অবলম্বন। তাই "একালের মুসলমান সমাজে যে সব ভাব-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার মূলে ছিল প্রাচীন ধর্মজীবনের আদর্শে ফিরে যাবার ইচ্ছা।" (পৃঃ এক)। ইসলামের উন্মেষযুগে ঋজু ও অবিকৃত ধর্মবোধই মুসলমানকে জগজ্জয়ী করেছিল,—মুসলমানরা এই কথা ভুলতে চায় নি। তাই ধর্মবিরোধের মাধ্যমে মুসলমানদের চেতনা-দানের ও পতন-রোধের চেষ্টা হয়েছে বারবার। পাক-ভারতের ইতিহাসের ধারায় দেখি, শেখ আহমদ সির-হিন্দী, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ আহমদ ব্রেলবী, তিতুমীর-কেরামত আলি-শরীয়তুল্লাহ-দুদুমিয়া, হালী-ইকবাল-ফররুখ প্রমুখের ভূমিকায় রয়েছে এ একই চিন্তা ও মতের অনুবর্তন। ওহাবী-ফরায়েজীর পিউরিটানিক মনোবৃত্তির কারণও এতেই নিহিত। আত্মিক-বিশ্বাসে শিথিল ও আত্মশক্তিতে দুর্বল মানুষ যখন আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হয়, তখন আত্ম-অপসারণই হয় আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় রূপে বিবেচিত। সবল জানে অপরের সব কিছু আত্মসাৎ করাই আত্ম-

প্রসারের একমাত্র পথ। আর দুর্বল ভাবে আত্মসংকোচনেই আত্মরক্ষা সম্ভব। তাই ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে হিন্দুরা যখন ভাবছে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার মধ্যেই রয়েছে অমৃত,—প্রাণের উৎস, তখন মুসলমানরা বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষায় খুঁজছে আবে-হায়াত। স্থান-কাল প্রসূত প্রতিবেশ-পরিবেষ্টনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার মধ্যেই যে সামাজিক তথা জাতীয় জীবনের ঋদ্ধি নিহিত, তা উপলব্ধি করার মতো মননের ঐশ্বর্য তাঁদের ছিল না। তাই তেরোশ' বছরে সঞ্চিত সম্পদ পরিহার করে ও অর্জন-বিমুখ হয়ে তাঁরা মুসলমানের পতন-রোধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য যদিও মহৎ, সামর্থ্য ছিল সীমিত, পথ ছিল ভ্রান্ত। গ্রহণ, বরণ, অর্জন ও সমন্বয় সাধনের উপরই যে জাতীয় প্রগতি নির্ভরশীল, তা' বুঝিয়ে দেবার জন্যে স্যর সৈয়দ আহমদের মতো ব্যক্তিত্ব ও চিন্তানায়কের আবির্ভাব-কাল অবধি মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যদিও সিপাহী-বিপ্লব কালে উত্তর-ভারতে সৈয়দ আহমদের ভূমিকা নতুন করে যাচাই করা প্রয়োজন। কেননা, সেই সময়ে সেখানকার পরিবেশে তাঁর বৃটিশ-প্রীতি সেখানকার মুসলমানের স্বার্থের অনুকূল ছিল কি-না, নতুন নিরিখে পরখ করে দেখা দরকার।

কাজেই ডক্টর আনিস যখন বলেন, "সমাজের নতুন বিন্যাস, মানবিক সম্পর্কের পুনর্নির্ধারণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—এই সমস্ত উদ্দেশ্য তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া, ফারায়েজী আন্দোলন এবং তিতুমীরের সংগ্রামের মধ্যে সুস্পষ্ট। তবে তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল আদি ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা। (পৃঃ চার)। ...রাষ্ট্রিক ক্ষমতা-অর্জনের চেষ্টা মুসলমান সমাজে দেখা দিল আরো পরে। (পৃঃ পাঁচ)। ঘটনাক্রমে সেগুলো ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়।" (পৃঃ ছয়),—তখন তা আমরা বিনাদ্বিধায় সহজে গ্রহণ করতে পারিনে। কেন না, মুসলমানদের মধ্যে এসব আন্দোলন দেখা দেয় 'পতন-রোধ' ভাবনায়, সম্পদ ও স্বাধীনতা হারানোর ফলে বা হারানোর আশঙ্কায়। কাজেই ইসলামের প্রথম যুগের ইমান ও জীবনচর্যার বলে বলীয়ান হয়ে সম্পদ-স্বাধীনতা অর্জন বা রক্ষণ প্রয়াসেই এ সব ভাব-আন্দোলনের উদ্ভব। ধর্ম ভাব-জাগানোর মাধ্যমে জাতীয় উন্নতির তথা আযাদীর প্রেরণা দানের গভীর ও গুপ্ত উদ্দেশ্যেই হালী-ইকবাল-ফররুখ প্রভৃতি কলম ধরেছিলেন।

অতএব, বাহ্যত গোড়ার দিকে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা-অর্জন প্রয়াস না থাকলেও লক্ষ্য যে তা-ই ছিল, (এবং পরিণামে যে তা-ই হলো), তা অনস্বীকার্য। প্রস্তুতিপর্বের কার্যক্রম ছিল উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় মাত্র।

বিশ্বাসের অঙ্গীকারে জাগে ধর্মবোধ। আস্তিক মানুষের জীবনে ধর্মই নিয়ন্ত্রীশক্তি। এবং ধর্মমাত্রেই পুরোনো। কাজেই মানুষ জীবনের আদর্শ খোঁজে অতীতে। অতএব, ঐতিহ্যে আদর্শ সন্ধান করে মুসলমানরা ভুল করেনি। ব্যর্থতার বীজ ছিল তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায়। কে না জানে, পশ্চাৎদৃষ্টি অগ্রগতির অন্তরায়। কিন্তু তারা দেশকালের চাহিদা ও প্রভাব এড়িয়ে অদ্ভুত জীবনের স্বপ্ন রচনা করছিল। তাই তারা "প্রাচীনতর জীবন যাত্রার দিকেই সকলকে আকর্ষণ করেছে, আধুনিক জীবন-পদ্ধতির যোগ ঘটায় নি।" (পৃঃ চার)। অতএব, পুরোনো-প্রীতি ও নতুন-ভীতিই তাঁদের প্রয়াসের ব্যর্থতার মূল কারণ। সে জন্যেই "বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে আধুনিক জীবন ও জগতের বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে এদের দায়িত্ব যথেষ্ট।" (পৃঃ এক)।—ডক্টর জামানের এই মন্তব্য সঙ্গত ও যথার্থ বলে গ্রহণ করতে হয়।

খ. ডক্টর আনিসুজ্জামান বলেছেন, ১. "লাখেরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।" (পৃঃ পাঁচ) ২. "মুসলমানের প্রতি কোন কোন ইংরেজ-শাসক বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করলেও এটি সরকারী নীতিতে পরিণত হয়নি। এবং রাজ্য হারাবার জন্যে মুসলমানেরাও সরাসরি ইংরেজ-শাসন বিদ্বেষী হয়ে পড়েন নি।" (পৃঃ পাঁচ)। ৩. "মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, একথা প্রমাণ করা দুষ্কর।" (পৃঃ ছয়)। ৪. "আর্থিক সঙ্গতি ছিল বলেই বাঙালী হিন্দু ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলেন। আর তার অভাবেই বাঙালী মুসলমান পিছিয়ে পড়লেন।" (পৃঃ ৩৩)।

১. লাখেরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ডক্টর আবদুল করিম দেখিয়েছেন যে (সাহিত্য পত্রিকা : বর্ষা, ১৩৭২ সন, পৃঃ ২২৪-৩৮) লাখেরাজ সম্পত্তি হিসেবে শুধু মুসলমানদেরকে প্রদত্ত জমি পনরটি বিভিন্ন নামে এবং শুধু হিন্দুদেরকে প্রদত্ত জমি তিনটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল এবং মুসলমান

ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোককে প্রদত্ত জমি নয়টি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান জমিদারও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা, সুফীদের দরগাহ বা কবর ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্পত্তি দান করত। হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তি শুধু এই দ্বিতীয় প্রকারের সম্পত্তির সঙ্গে তুলনীয় সুতরাং বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে মুসলমান ও হিন্দুরা সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি; মুসলমানদের লাখেরাজ সম্পত্তি হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। (পৃঃ ২৩১)। পদস্থ কর্মচারীরাও নানা প্রকার লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন এবং তাঁরা সাধারণ ভাবে মুসলমানই ছিলেন। (সাঃ পঃ ২২৮-২৯,২৩১)। কিন্তু এ সত্ত্বেও ডক্টর আনিসের সিদ্ধান্তটি সঙ্গত। তিনি বলেন, "নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলে সক্রিয় ছিল যে মুদ্রার প্রভাব ও প্রতিপত্তি, সেই নগদ অর্থ মুসলমানের হাতে সঞ্চিত হতে পারেনি।" কেননা, "ইংরেজ-শাসন কালে গ্রাম-কেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজে ভাঙন ধরে, জীবন যাত্রা হয়ে ওঠে শহরমুখী আর অর্থনৈতিক জীবনের মূল মাপকাঠি জমি থেকে রূপান্তরিত হয় মুদ্রায়। ···নতুন জমিদারী যারা লাভ করেন, তাঁরাও হিন্দু-সন্তান।···ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পান হিন্দু সম্প্রদায়ের আর একদল। এমনি করে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেও হিন্দু প্রাধান্য দেখতে পাই।' (পৃঃ তিন-চার)।

২. ডক্টর আনিস বলেছেন, মুসলমান-বিদ্বেষ সরকারী নীতিতে পরিণত হয়নি। কিন্তু একথা সরল মনে গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, গোড়ার দিকে কোম্পানী-সরকারের যে মুসলমান-ভীতি ছিল, এবং সে কারণে যে মুসলমান সম্পর্কে সর্তকতামূলক ব্যবস্থাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে তার সাক্ষ্য মেলে কোম্পানীর চিঠিপত্রে ও দলিল-দস্তাবেজে (Early correspondences of East India Company-Dr. D. N. Banerjee) কাজেই প্রকাশ্যে না হোক, গোপনে যে কোম্পানী-সরকারের মুসলিম বিরূপতা ছিল, তা মনে করা অসঙ্গত নয় (বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা—গোপাল হালদার)।

ডক্টর আনিসের আর একটি ধারণা, 'রাজ্য হারাবার জন্য মুসলমানেরাও সরাসরি ইংরেজ-শাসন বিদ্বেষী হয়ে পড়েনি।'—কিন্তু ফকির বিদ্রোহ, জমিদার বিদ্রোহ, ফৌজদার বিদ্রোহ প্রভৃতি বিপরীত সিদ্ধান্তের অনুকূল। বৃটিশের চোখে নিছক দস্যু হতে পারে, কিন্তু ফকিরেরা আসলে ছিল রাজদ্রোহী এবং

সে কারণে ধ্বংসাত্মক কার্যে ব্রতী। এযুগের ভাষায় তারা ছিল saboteur. উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের ইপির ফকিরদের কার্যক্রম ও দস্যুবৃত্তি এ সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। দূরদর্শী 'রাজনীতিজ্ঞ' শিক্ষিত নেতার অভাবই তাদের আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ। এ ছাড়া কোম্পানীর প্রভাব বৃদ্ধিতে ভারতব্যাপী রাজন্যবর্গের বিচলনও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। রাজতন্ত্রের যুগে গণ-আন্দোলন আজকের মতো সর্বজনীন ও সর্বাত্মক হওয়ার পরিবেশ পায়নি। দেশাত্মবোধ ও জাতীয়-চেতনা জনমনে তখনো দানা বেঁধে উঠতে পারেনি বলে, অসন্তোষ যতটা ব্যক্তিক ছিল, ততটা ছিল না সংগঠন কিংবা সঙ্ঘমুখী। সেটি এলো পরে প্রতীচ্য-প্রভাবে এবং তা' ওহাবী, ফরায়েজী ও সিপাহী বিপ্লবে সুপ্রকট। একারণেই হৃতরাজ্য মুসলমানের মনোভাব সম্বন্ধে ভুল ধারণার অবকাশ মেলে। মুসলমানরা যে শেষাবধি বৃটিশ-বিদ্বেষ জিইয়ে রেখেছিল, তার প্রমাণ কাফের-বিদ্বেষী আলিমরা বৃটিশ বিতাড়ন-বাঞ্ছায় ১৯৪৭ সন অবধি জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন।

৩. মুসলমানরা সাধারণভাবে যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বৃটিশ-বিদ্বেষ হেতু বিরূপ ছিল, তার আভাস আমরা আমাদের কালেও পেয়েছি। ইংরেজী পড়লে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবে, মরবার সময় water water করে মরবে, ইংরেজী শিখলে ইমান রাখা যাবে না, নসরার দুর্ভোগই ভুগতে হবে পর-লোকে প্রভৃতি বিশ্বাস আমাদের কালেও গ্রামাঞ্চলে চালু ছিল। ১৮৫০ সনের দিকেও এ ধরণের মনোভাব প্রত্যক্ষ করি (পৃঃ ৮৪)। তা ছাড়া আলিমের ওয়াজে বহুবার শুনেছি, 'এলম তলব' মানে দ্বীন-ই-এলম—অন্য বিদ্যা নয়। বৃটিশের প্রতি যদি বিদ্বেষ থাকে, তা হলে বৃটিশের সব কিছুর প্রতিও যে বিরূপতা থাকবে তা' সহজে অনুমেয়। এর জন্যে দলিল দাখেলের প্রয়োজন সামান্য। অসহযোগ ও বিলেতী বস্তু বর্জন আন্দোলনের কথা এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য।

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি যদি বিরূপতা না-ই থাকবে, তাহলে মাদ্রাসায় ১৮৩৫ সন থেকে প্রাত্যহিক জীবনে আবশ্যিক ইংরেজী শিক্ষা (অন্ততঃ অক্ষর পরিচয় ও নাম ঠিকানা পড়ার ও দস্তখত দেয়ার মতো) চালু হলো না কেন? আর এ রকম একটা সামাজিক সমস্যা না থাকলে দিল্লীতে কলেজে পড়া বা ইংরেজ-সরকারে চাকরী নেয়ার ব্যাপারে শাহ্ আবদুল আজিজের

কাছে ফতওয়া চাওয়া হলো কেন? (পৃঃ ২২) দিল্লীতে যদি সমস্যা থাকে, বাঙলাতে তা' নানা কারণে আরো তীব্র হওয়ারই কথা। যে দেশে 'দারুল হরব' ও 'দারুল ইসলাম' সমস্যার সমাধান খুঁজতেই কোম্পানী রাজত্বের একশ' বছর কেটে গেল, সেদেশে বৃটিশ-বিদ্বেষ ছিল না মনে করা কঠিন। টোলের ঐতিহ্যাশ্রিত ব্রাহ্মণ-পরিবারেও ইংরেজী শিক্ষা ছিল অবাঞ্ছিত।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু মুসলিম-সমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার রোধ করা যেত না। হিন্দু সমাজে কালাপানির ছোঁয়ায় জাতিনাশের আশঙ্কা এবং সমাজে পতিত থাকার দুর্ভোগ অন্নদাশঙ্কর রায়ের কালেও ছিল (আলাপঃ মাহবুবউল আলম)। তবু উনিশ শতকের গোড়া থেকে কোন বাধাই উচ্চাভিলাষীদের গতিরোধ করতে পারেনি। পারলৌকিক শাস্তির ভীতি রয়েছে, একঘরে থেকেছে, সমাজে লাঞ্ছিত হয়েছে, কিন্তু বিলেতী জ্ঞানের ও তজ্জাত ধন-যশ ও মানের লোভ পরিহার করেনি। মুসলমান সমাজেও বিষয়ী অভিজাতরা উদাসীন ছিল না। তারাও সন্তানদের জন্যে ইংরেজী শিক্ষা কামনা করে ছিল। জমিদাররা ছাড়াও সৈয়দ-কাজী-মীর পরিবারে সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষাদানের চেষ্টা হয়েছিল। (পৃঃ ৩০-৩১) কিন্তু অর্থোপার্জনের প্রেরণা ছিল না বলে সে শিক্ষা এগোয়নি। (তালিকা ১, পৃঃ ৩৫)। এক্ষেত্রে আবদুল লতিফ-আমীর আলী-আলী হোসেনের মতো উচ্চশিক্ষিত, জমিদার-নন্দনদের মতো স্বল্পশিক্ষিত এবং মীর মুশাররফ হোসেন, (সৈয়দ) কায়কোবাদের মতো শিক্ষা-কামীদের কথা স্মর্তব্য। কিন্তু অন্য কারণেই বাঙলার মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। সে কারণ বলছি।

৪. 'আর্থিক সঙ্গতির অভাবেই বাঙালী মুসলমান শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়লেন'—এ ধারণা যথার্থ বলে মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাস, বাঙালী মুসলমানের লেখা-পড়ার ঐতিহ্য ছিল না বলেই তারা কোন শিক্ষাই গ্রহণ করার গরজ বোধ করেনি। আমাদের এ বিশ্বাসের সমর্থনও মেলে:

(ক) হিন্দু সমাজে বর্ণ হিন্দু (ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ) ছাড়া আর কারো শিক্ষা লাভের অধিকার ছিল না। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরই সর্ব প্রকার বিদ্যা অর্জনের অবাধ অধিকার—অন্যদের নয়। উনিশ শতকেও হিন্দু সমাজে নিম্নবর্ণ অগ্রীস্টান শিক্ষিত ছিল বিরল। এ সময়ে আমরা শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মনন ক্ষেত্রে

ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই প্রত্যক্ষ করি। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ্য।

(খ) নিম্নবর্ণের—একালের পরিভাষায় তফশীলভুক্ত—হিন্দুই যে অধিক সংখ্যায় ইসলাম বরণ করেছিল, এ সত্য আজকাল কেউ আর অস্বীকার করে না। কাজেই দেশজ মুসলমানের শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না। ডক্টর আনিসও বলেন, "এদেশের সংখ্যা গুরু মুসলমানেরা মূলতঃ এদেশীয় অমুসলমানদের উত্তর পুরুষ।...এদেশের হিন্দু ধর্ম ত্যাগী মুসলমানেরা আবার তাদের পূর্বেকার বা পূর্বপুরুষ গত বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী বিভক্ত থাকতেন।" (পৃঃ ৮)। সাধারণত নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই হয়েছে মুসলমান। তাঁতীরা মুসলমান হয়ে হলো জোলা, জেলেরা হলো কৈবর্ত, বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা হলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাউল। আর এমনিতেও বোঝা যায়, পরাণ প্রামাণিক, গোপাল মণ্ডল, বানু বিশ্বাস লালন-কানাই-পাঞ্জু-শীতলাং প্রভৃতি কিংবা শেখ বাবু বা শেখ পাঁচু আজো যে সব মুসলমানের নাম তাদের পূর্বপুরুষের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মান কিরূপ ছিল।

(গ) ইংরেজ-আধিপত্যের সূচনায় অনেকে (অভিজাতরা—পদস্থ কর্মচারীরা) বাংলা দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে চলে যান। (পৃঃ ৯)—এটি ঐতিহাসিক সত্য। এ ছাড়াও তেরো শতক থেকে ১৭৬০ সন অবধি গৌড়-ঢাকা-মুর্শিদাবাদ সরকারে বাঙালী মুসলমান উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিল এমন দৃষ্টান্ত বিরল। উত্তর ভারতীয় মুসলমানরাই বিভিন্ন উচ্চ পদে থেকে বাঙলা দেশ শাসন করেছে। ক্রমে হাবসী, ইরানী ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন গোত্রীয় ভাগ্যান্বেষী এখানে আমীর, উজির, সেনানী ও সামন্তের পদ পেয়েছে, কিন্তু বাঙালী মুসলমানে পায়নি। সরকারী নীতি ছাড়াও শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাবই তার অপর কারণ বলে মনে করি, কেননা হিন্দু কায়স্থ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ যখন গৌড়-ঢাকা মুর্শিদাবাদে উচ্চ পদ পাচ্ছে, তখন বাঙালী মুসলমান সেখানে অনুপস্থিত বা বিরল। বিদেশীরা সাধারণত অবসরগ্রহণের পর উত্তর ভারতে চলে যেতো। কেননা, বৃষ্টিবহুল জলকাদাময় বাঙলা দেশরূপ দোজখের আর্দ্র আব-হাওয়া তাদের সহ্য হতো না। শাহজাদা শুজা অবধি অনেকের মুখেই এ ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও জায়গীর বা সম্পদ-লোভে যারা থেকে গেছে, তারাই এদেশের অভিজাত। বর্ধমান থেকে চট্টগ্রাম এবং মালদহ

থেকে সিলেট অবধি যেই সব মুসলমান জমিদার কিংবা হৃত-সম্পদ অভিজাত আজো রয়েছেন, তাঁদের কারো মাতৃভাষা বাংলা নয়। এঁদেরই একজন নবাব আবদুল লতিফ। এবং ইনিই বলেছেন যে বাঙালী মুসলমানের মাতৃ ভাষা উর্দু এবং কেবল দেশজ মুসলমানের ভাষাই বাংলা। মীর মুশারফ হোসেনের পিতা বাংলা হরফও চিনতেন না। (পৃঃ ৪৫৫) উনিশ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে এঁরাই ধন ও পদাধিকার বলে বাঙালী মুসলমানের মুখপাত্র ছিলেন। আর এঁরাই রটিয়েছিলেন যে বাঙালী মুসলমানের ভাষা উর্দু; বাংলা হলো হিন্দুর ভাষা। এর ফলেই ইতিহাসে অজ্ঞ নব শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান পড়েছিল ধাঁধায়, হয়েছিল বিভ্রান্ত। তারা কথা বলছিল বাংলায়, স্বপ্ন দেখছিল উর্দুর। তাই উর্দু-বাংলা হেঁয়ালির সমাধান খুঁজতে গেল অর্ধশতাব্দী। (পৃঃ ৪৫৪-৫৮)।

(ঘ) এঁরা ছাড়া আর এক শ্রেণীর কৃত্রিম অভিজাত ছিলেন, তাঁরা হলেন পীর, মোল্লা, মুয়াজ্জিন। মক্তব মাদ্রাসায় সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁরা জনগণের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অর্থ আদায় করতেন। এতে ছিল তাঁদের মৌরুসী স্বত্ব। তাঁদের মধ্যে ক্বচিৎ কেউ পুরো বিদ্যা অর্জন করে হতেন আলিম! মৌলানা কেরামত আলির প্রভাবের আগে ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামে আলিম তথা মাদ্রাসা শিক্ষিত লোক ছিল বিরল।

আর একশ্রেণীর শিক্ষিতলোক ছিল, যারা পাঠশালায় বাঙলার মাধ্যমে মনকষা-সুদকষা, কাঠাকালি-বিঘাকালি প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের অপরিহার্য গাণিতিক শিক্ষা গ্রহণ করে নায়েব-গোমস্তা-মুনশী হত। হিন্দু কায়স্থের তুলনায় এদের সংখ্যাও বেশী ছিল বলে মনে হয় না। বাদবাকি ছিল পুরুষানুক্রমে নিরক্ষর।

(ঙ) দারিদ্র্যই যদি শিক্ষাদানের বা গ্রহণের পথে বাধা হয়, তা হলে না হয়, ব্যয়বহুল ইংরেজী শিক্ষা না-ই পেল বা দিল, কিন্তু মসজিদ-কেন্দ্রী মক্তবে আরবী-ফারসী শিক্ষারও যে তাদের আগ্রহ ছিল না, তার সাক্ষ্য মেলে ডক্টর আনিস-প্রদত্ত ২ ও ৩ সংখ্যক তালিকায় (পৃঃ ৩৫)।

(চ) মুসলমান ছিল দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ (অন্ততঃ উনিশ শতক থেকে)-এ কথা ডক্টর আনিসও মানেন (পৃঃ ৯)। আর সমাজে যে 'আশরাফ-

আতরাফ' ও 'শরিফজাদ-আজলাফজাদ' হিসেবে বৈষম্য ছিল, তা'ও তাঁর স্বীকৃতি পেয়েছে (পৃঃ ৮)। তাহলে, গাঁয়ে দু'চার ঘর সচ্ছল বা সঙ্গতি সম্পন্ন চাষী পরিবার ছিল না, কিংবা দু'একজন গোমস্তা-মুনশীরও অভাব ছিল অথবা শরীফ-আশরাফ মাত্রেই ছিল দরিদ্র—এমন ধারণা পোষণ করতে হলে কল্পনার অনেকখানি প্রশ্রয় প্রয়োজন। স্মরণীয় যে ওহাবী বিপ্লবে বাঙালীরাই অর্থ যুগিয়েছে বেশী (পৃঃ ৪৩)—যা দরিদ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, শরাফৎ ও সংস্কৃতি-চেতনা যাদের ছিল, তারাও হয়তো অর্থোপার্জনের প্রেরণা ছিল না বলে শিক্ষা দানে বা গ্রহণে যত্ন নেয়নি, তাই বলে নিরক্ষর হবে কেন? আমরা মুসলমানদের নিরক্ষরই দেখেছি। কেবল 'ঘ'-এ আলোচিত শ্রেণীর মধ্যেই নিরক্ষরতা ছিল না।

(ছ) উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে পাটের চাহিদাও পাটচাষের বৃদ্ধিই মুসলমান চাষী সমাজে শিক্ষা বিস্তারের কারণ বলে ডক্টর আনিস অনুমান করেছেন (পৃঃ ৮৮)। ফেণী-চট্টগ্রামে পাটচাষ ছিল না, সেখানে কিন্তু আলোচ্য সময়ে শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে খানসামারা ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করলে তাদের সন্তানদের সে-বিদ্যা থেকে বঞ্চিত রাখতো না। ডক্টর আনিস যথার্থই বলেছেন—তারা ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দিয়েছে সদকা-ই-জারিয়া হিসেবে (পৃঃ ৮৮)। আসলে ১৮৬০ সনের পরে বৃটিশ-বিদ্বেষী ওহাবী আন্দোলনের অবসানে, উত্তর ভারতীয় সৈয়দ আহমদের বাঙালী ভাবশিষ্যদের অনুকূলতায়, সর্বোপরি কোম্পানীর শতাব্দকালীন শাসনের ও সংস্কৃতির প্রভাবে বৃত্তি ও বর্ণের বাধামুক্ত জনমনে শিক্ষার মাধ্যমে উন্নততর জীবন (তথা ধন ও মানের) বাঞ্ছা জাগে। তা'ছাড়া এ সময়ে কলকাতার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল-কলেজ গড়ে উঠে। এভাবে প্রেরণা ও সুযোগের সমবায়ে ইংরেজী শিক্ষা মুসলমান সমাজেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু আকস্মিকভাবে সরকারী চাকুরীর অভাবে বেকার সমস্যা দেখা দিলে মুসলমান চাষী সমাজের উৎসাহে ভাটা পড়ে। পাকিস্তানোত্তর যুগেও শিক্ষার মূল্যবোধে নয়—উপার্জনের ও ভাগ্য পরিবর্তনের তথা দারিদ্র্য ও অসম্মান এড়ানোর জন্যেই চাষীরা সন্তানের শিক্ষা কামনা করছে। হিন্দুদের বৃটিশ বিদ্বেষ ছিল না, ছিল খ্রীস্টানযাজক ভীতি (পৃঃ ৩৩)। তা ছাড়া কলকাতা ছিল পলাশীর

যুদ্ধের আগে থেকেই হিন্দু-উপনিবেশ, ইংরেজী শিক্ষা চালু হয় সেখানেই, এবং নিবদ্ধও থাকে সেখানে অনেককাল। আর ডক্টর আনিসও বলেছেন, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর 'হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারকে ত্বরান্বিত' করেছেন (পৃঃ ৩৪)। অতএব, ডক্টর করিমের ধারণাই যথার্থ বলে মনে হয়; তিনি বলেন, 'লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলমান জমিদাররা সর্বস্বান্ত হয় (এটি ডক্টর আনিসেরও মত; আমাদের বিশ্বাস অনেক অভিজাত পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে উত্তর ভারতে চলে যায়); অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, বাংলা দেশের মুসলমান আভিজাত্যের (aristocracy) কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। সুতরাং শুধু কৃষক এবং শ্রমজীবীদের দ্বারা হারানো কাঠামো ঠিক রাখা সম্ভব নয়; শিক্ষা দীক্ষার প্রতি তারা কোন সময় আগ্রহান্বিত ছিল না, এখনও হয়নি।' (সাঃ পঃ পৃঃ ২৩৫) কিন্তু ডক্টর করিম যখন বলেন, "পুরোনো অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা প্রথমে যতদূর সম্ভব আরবী ও ফারসী শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেন, ইংরেজীর প্রতি তাদের চেতনা ফিরে আসে অনেক পর; তখন হিন্দুরা অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে।" (সাঃ পঃ পৃঃ ২৩৫-৩৬)—তখন আমরা তাঁর মতে সায় দিতে পারিনে। কারণ গ ও ঘ-এ ব্যাখ্যাত হয়েছে। বাঙলা দেশে অভিজাতের সংখ্যা বেশী থাকলে ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে উত্তর ভারতীয় অভিজাতদের মতো (পৃঃ ৮৮) তারাও সংখ্যায় অধিক থাকতো। এ সূত্রে এও স্মর্তব্য যে আভিজাত্য- ও সংস্কৃতিহীনতার জন্যে মুঘল আমলেও বাঙালী মুসলমান উত্তর ভারতীয়দের কাছে অবজ্ঞেয় ছিল। তার প্রতিধ্বনি পাই ফরিদপুরের অবাঙালী বংশোদ্ভব উর্দুভাষী নওয়াব আবদুল লতিফের উক্তিতে।

গ. মুর্শিদকুলি খানের ভূমিব্যবস্থায় ও কোম্পানীর রাজস্ব গ্রহণনীতিতে কি পার্থক্য ছিল, তা বিশদভাবে আলোচিত হলে, পাঠক সহজেই তার ফলাফলের ধারণা করতে পারতেন (পৃঃ ১০)।

ঘ. লেখক বেদনাবোধ নিয়েই বলেছেন, "যে ধরণের বিষয় নিয়েই লিখে থাকুন না কেন, লেখকের ধর্মীয় অস্তিত্ব সেখানে ছায়া ফেলেছে।" (পৃঃ বারো) আবার বলেছেন, "আশ্চর্যজনক হলেও একথা সত্য যে, আধুনিককালে ভারতের জাতীয় চেতনা বা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা তার ধর্মীয় ভাবধারা থেকেই জন্মলাভ করেছে।" (পৃঃ ৭৬)। তাঁর মতে এর কারণ

"ইংরেজ-আমলে নতুন ধর্মান্দোলনের প্রেরণা জেগেছিল আধুনিক শিক্ষালব্ধ আত্মজিজ্ঞাসার তাগিদে এবং খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারণার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি থেকে।" (পৃঃ ৭৭) ডক্টর আনিসের এ ব্যাখ্যা সঙ্গত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এর গভীরতর কারণ রয়েছে। সাধারণভাবে মানুষের জীবন ধর্ম-বোধাশ্রিত ও সংস্কার-চালিত। তাই জগৎ ও জীবনকে নির্বর্ণ-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা কঠিন। ফলে মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, অধিকার-চেতনা, ন্যায়-অন্যায় ও পাপপুণ্য-জ্ঞান প্রভৃতি গড়ে উঠে ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রভাবে। জীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যও নিয়ন্ত্রিত হয় শাস্ত্রীয় শাসনে। কাজেই ধর্মাশ্রিত জীবনের ভাব-ভাবনা ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া প্রায়-অসম্ভব। তাই স্বাজাত্যবোধের ভিত্তি হয়েছে ধর্ম, সাহিত্যের অবলম্বন হয়েছে শাস্ত্রীয় অঙ্গীকার, নৃত্য ও চিত্রশিল্পাদি ললিত কলায়ও পাই স্থূল শাস্ত্রীয় নির্দেশের আনুগত্য। কারু, চারু, স্থাপত্য শিল্পকেও করেছে ধর্মাচারের অনুগত। অতএব, এদেশেও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা ও সাহিত্যশিল্প ঐতিহাসিক নিয়মেই গড়ে উঠেছে। এই অমোঘ নিয়মেই "জাতীয়তাবাদ আর হিন্দু জাগরণবাদ সমার্থক হয়ে উঠেছিল।" (পৃঃ ৮৩)। হিন্দুরা যেমন তাদের ধর্মে ও বঙ্গবহির্ভূত ঐতিহ্যে খুঁজেছে নবজাতি গঠনের উপকরণ ও প্রেরণা, মুসলমানরাও তেমনি অবলম্বন করেছে উন্মেষ যুগের ইসলাম ও মুসলিম নায়কদের, আর ধর্মীয় ঐক্যসূত্রে আরব-ইরান ও তুরানের ঐতিহ্যকে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই স্বাতন্ত্র্যেই পেয়েছে স্বাজাত্যের স্বাদ—সমন্বয়ে নয়। উভয়ের মধ্যে তাই রয়েছে আদর্শগত ঐক্য, উদ্দেশ্যগত মিল, পার্থক্য ছিল কেবল সামর্থ্যে। হিন্দুদের ছিল উচ্চশিক্ষা ও মনীষা, মুসলমানরা সম্বল করেছিল স্বল্পবিদ্যা, ও ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্ব মুসলিম ঐক্যবাদকে। অক্ষম স্বভাবতই জ্ঞাতি ও আত্মীয়ের গৌরবগর্বী হয়, এবং বর্তমান আর্তনাদকে ঢাকতে চায় ঐতিহ্যের আস্ফালনে (পৃঃ এগারো, বারো, ৪৫২)। যে-কল্যাণবুদ্ধি, যে-উদারতা এবং যে-নিরবয়ব মনুষ্যত্ববোধ থাকলে ক্ষুদ্র-স্বার্থ চেতনা ও ভেদবুদ্ধির উপরে উঠে মানবতার উচ্চ মিনারে দাঁড়িয়ে অবিশেষ মানুষকে মিলন-ময়দানে আহ্বান জানানো সম্ভব হয়, তা' অসামান্য পুরুষেই লভ্য। আর স্বাধীনতা অর্জন-বাঞ্ছায় সাধারণ মিলনকামীর কাজে ও কথায় সঙ্গতি খোঁজা নিরর্থক (এগারো ৪১০, ৪৫৪)। তবু এদেশে একদা সত্যপীর-সত্যনারায়ণ-কেন্দ্রী মিলন-ময়দান

রচিত হচ্ছিল অসহায় মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার প্রয়োজনে। আর মানবতার মহত্তম বিকাশ দেখি বাউলের অভেদ-দৃষ্টিতে (পৃঃ দশ)।

হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের স্বরূপ চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ডক্টর আনিস :

> হিন্দু ঐতিহ্যগর্বের একটা ফল দেখা দিয়েছিল মুসলিম-বিদ্বেষী ভাবের উদ্বোধনে। ...হিন্দু লেখকদের রচনায় ঐতিহাসিক পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ স্মৃতির চর্চা করা হয়েছিল; মুসলমান লেখকরাও তার জবাব দিয়েছিলেন।" (পৃঃ এগারো-বারো ৪০৬-০৭,৪৫৩)

> "বঙ্কিমচন্দ্র ভাবলেন বাঙালীর কথা, লিখতে চাইলেন তাদের বর্তমান ভূখণ্ডের ইতিহাস এবং আরব মুসলমানদেরকে সেখানে দেখতে পেলেন বহিঃশত্রু ও আক্রমণ-কারীরূপে। আবদুর রহিম ভাবলেন বাঙালী মুসলমানের কথা, লিখতে চাইলেন মুসলমানের প্রাচীন গৌরবের কাহিনী এবং ভারতীয় হিন্দুদেরকে দেখতে পেলেন সংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকরূপে, যে অজ্ঞান-অন্ধকার থেকে মুসলমানেরা তাঁদেরকে উদ্ধার করলেন অথবা যে অন্ধকারের ওপর সত্য ধর্মের আলোক জয়ী হল। এঁদের দৃষ্টিভংগী কেবল স্বতন্ত্র নয়, পরস্পরবিরোধীও। একজন ভারত থেকে আরবকে দেখলেন : অন্যজন আরব থেকে ভারতকে। ফলে বঙ্কিম অনেক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ও ভারতীয় বলতে মুসলমানবর্জিত দেশ ও হিন্দুকে বুঝলেন, আবদুর রহিম বা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন অন্যেরাও ইসলামী বলতে বুঝলেন অভারতীয় ঐতিহ্য এবং ভারতবর্ষের তুলনায় আরব-তুরস্ককে নিজস্ব বলে ভাবতে শিখলেন। ফলে, এদেশের মাটিতে-দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলমানের একাত্মতাবোধ করার সম্ভাবনা ক্রমেই কমে এল। (পৃঃ ৩০৮)।

> হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূলে অমুসলমান সম্প্রদায়ের দায়িত্ব এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে। আমরা দেখেছি যে, বাংলার নবজাগরণ দেখা দিল হিন্দু সমাজকে আশ্রয় করে। কিন্তু অচিরেই এই নবজাগৃতি রূপ নিল হিন্দু পুনর্জাগরণের। তখন প্রাচীন ভারতের ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপরে জোর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মানসে তার অতীত সমৃদ্ধি ও বর্তমান উন্নতির তুলনায় মধ্যযুগের ইতিহাসকে মনে হল লজ্জাজনক। আর এর জন্যে তাঁরা স্বভাবতঃই দায়ী করলেন মুসলমানদেরকে—যাঁরা আক্রমণকারী রূপে একদা এদেশে পদার্পণ করে ছিলেন। তাঁরা ভুলে গেলেন যে, সেই আক্রমণকারী মুসলমান আর সমকালীন পরাধীন মুসলমান সব দিক দিয়ে ভিন্ন। শিক্ষিত হিন্দুর মনে স্বাধীনতার যে

প্রেরণা এসেছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ সেদিন সম্ভবপর ছিল না। কেননা, ইংরেজ-শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা, তার স্থায়িত্বে আস্থা এবং তার শক্তিমত্তায় ভীতি—এই মিশ্র মনোভাব শিক্ষিত হিন্দুর অন্তরে বাসা বেঁধে ছিল। তাই মুঘল-রাজপুত বা মুঘল-মারাঠার দ্বন্দ্বের আলোচনায় হিন্দু-মানস একই সঙ্গে মুসলমানের সম্পর্কে ক্ষোভ এবং স্বাধীনতার পুস্তকী অনুপ্রেরণা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলমান সমাজে স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার উদ্বোধনে ইসলামের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে গর্ববোধ করতে গিয়ে মুসলমানের পক্ষে হিন্দুর প্রতি প্রীতিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি। মুসলমানও নিজেদেরকে বহিরাগত রূপে কল্পনা করে তৃপ্তি লাভ করেছেন। তার উপর, ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত হিন্দু লেখকদের কাব্য ও উপন্যাস তাঁদেরকে বিচলিত করেছে এবং তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায় খুঁজেছেন। হিন্দু লেখকদের এই ধরণের রচনা নিয়ে মুসলমানদের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। (পৃঃ ৪৫২)

এই ভাবে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ছায়াপাত করল: কতক স্বেচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়, কখনো বা পরিবেশের প্রভাবে। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ আর মুসলিম পুনর্জাগরণবাদ পূর্ণোদ্যমে স্বতন্ত্র লক্ষ্যের পথে ছুটে গেল। (পৃঃ ৪৫৩)

ঐতিহ্যমুগ্ধ মুসলমানদের সম্বন্ধে লেখক বলেছেন 'আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের যে চেষ্টা এঁদের মধ্যে দেখা যায়, তার মূলে কাজ করেছে, যে-কোন মানদণ্ডে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রবৃত্তি।' (পৃঃ ৪৬০)

লেখকের সুষ্ঠু চিন্তার এবং নিরপেক্ষ ও পরিচ্ছন্ন উদার দৃষ্টির প্রসূন এমনি মন্তব্য গ্রন্থের সর্বত্র মুক্তোর পাঁতির মতো শোভমান। 'দেশ ও কাল' নামের অধ্যায় চতুষ্টয়ে ইতিহাসের বক্র-দুস্তর পথ পরিক্রম করে তিনি তাঁর জ্ঞানের ও মননের ফসল অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। এমন জটিল বিষয়ের আলোচনায় তিনি এত অল্প বয়সেই পরিপক্ক মননের স্বাক্ষর রেখেছেন—দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আমরা যে-সব মন্তব্য করেছি, তা প্রতিবাদ নয়, আসলে তাঁর তথ্য-নির্ভর আলোচনায় ও বিশ্লেষণে বিতর্কের অবকাশ মেলে সামান্যই। অন্য দৃষ্টিতেও তথ্যগুলো যাচাই করা যে সম্ভব এবং ভিন্নতরো তত্ত্ব সন্ধানের আর সিদ্ধান্তে উত্তরণের পথও যে মুক্ত—কেবল

তাই দেখাতে চেয়েছি আমরা। ১৭৫৭ থেকে ১৯১৮ সন অবধি এ দুশো বছরের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচ্ছিন্ন আলোচনা আগেও হয়েছে। তবে এর আগে কোথাও এ যুগের মুসলমানের মন-মানস, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন চিত্রের সামগ্রিক রূপায়ণ হয়নি। ডক্টর আনিসুজ্জামান এক্ষেত্রে পথিকৃতের গৌরবের দাবীদার। বইটি সুলিখিত এবং বিষয়-গৌরবে গুরু। তাই আমাদের বক্তব্যও দীর্ঘ হল।

॥ ২ ॥

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম রচিত 'সাহিত্য ও চিন্তাধারা' আলোচিত হয়েছে। এ অংশও সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত ও সুলিখিত। এখানেও লেখকের পরিচ্ছন্ন ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টি সর্বত্র দৃশ্যমান। এখণ্ডেও লেখকের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ দক্ষতা সুপ্রকাশিত। ডক্টর আনিস-পরিব্যক্ত মত ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমাদের ধারণার দ্বন্দ্ব নেই। তবে কয়েকটি বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :

(ক) ডক্টর আনিস বলেছেন, "ইদানীং এর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য স্মরণ করে একে দোভাষী পুঁথি বলে আখ্যাত করা হচ্ছে। কিন্তু এই ভাষায় তো দুটি ভাষার নয়, বহু ভাষার (বাংলা, হিন্দী, ফারসী, আরবী ও তুর্কী) শব্দ এসে মিলেছে।...সুতরাং বিদেশী শব্দবাহুল্যের কথা বিবেচনা করে একে মিশ্র ভাষারীতির কাব্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে।" (পৃঃ ১১৭)। —কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। কেননা, একথা আজ কাল কেউ অস্বীকার করে না যে ভারতীয় ভাষায় কোনো আরবী শব্দই সোজাসুজি আসেনি, এসেছে ফারসীর মাধ্যমে। ফারসী ও তুর্কী শব্দ এদেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে শাসকদের প্রয়োগে ও প্রভাবে। ফারসী (কিছু তুর্কী) শব্দের আধিক্যে গড়ে উঠেছে আধুনিক উর্দু ভাষা, এর বিপুল প্রভাব পড়েছে হিন্দি ভাষায়। এ দুটোর আদি ও সাধারণ নাম ছিল হিন্দুস্তানী এবং এ ভাষা মুসলিম আমল থেকেই দিল্লী সাম্রাজ্যে Lingua Franca হিসেবে চালু ছিল। এই হিন্দুস্তানীর তথা উর্দু-হিন্দির সঙ্গে বাংলার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে আমাদের দোভাষী রীতি। দুনিয়ার কোন উন্নত ভাষাই অবিমিশ্র

নেই। বিদেশী শব্দের প্রয়োগে কোনো ভাষার জাত বদলায় না। তাই যদি হতো, তাহলে আরবী-ফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগের দরুণ সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল কিংবা নজরুল-ফররুখ-তালিম হোসেন প্রমুখ দোভাষী শায়ের হতেন। কাজেই দোভাষী রীতির বৈশিষ্ট্য অন্যবিধ। হিন্দুস্তানী বাক-ভঙ্গির অনুকৃতিই এই রীতির স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি। বাংলা ও হিন্দুস্তানী—এই দুই ভাষার বাক-রীতির মিশ্রণ ঘটেছে বলেই এটি দ্বিভাষী রীতি। অতএব, দোভাষী রীতিই এর যোগ্য ও যথার্থ অভিধা।

(খ) ১৭৭৮ সনে হ্যালহেড দেখেছেন, আরবী-ফারসী শব্দবহুল বাক্যই ভদ্রজনের ভাষার বৈশিষ্ট্য। ১৮৫৫ সনে লঙ এই ভাষাকেই জেনেছেন মাঝি-মাল্লার বুলি বলে (পৃঃ ১১৬)। সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখলে দুটো তথ্যই নির্ভুল বলে মানা যাবে। ১৭৭৮ সনেও মুসলিম-সংস্কৃতির প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, তাই এ যুগের ইংরেজী-জানা লোকের মতো শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ফারসী মিশ্রিত ভাষায় কথা বলতে গৌরব বোধ করত এবং তা একালের শিক্ষিত সমাজের ইংরেজীর মতো প্রকাশের সহজ মাধ্যম ও অভ্যস্ত রীতি রূপেই ছিল পরিগণিত। ১৮৩৫ সনে কিন্তু ১৮৫৫ সনে ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা নেহাত নগণ্য ছিল না কলকাতায়। তাছাড়া কেরী থেকে বিদ্যাসাগর অবধি লিখিয়েদের অর্ধশতাব্দ কালের সুপরিকল্পিত সাধনায় বাংলা যে পুরোপুরি সংস্কৃত-ঘেঁষা নয় কেবল—সংস্কৃত-সম হয়ে উঠেছিল, তা সবাই জানে। কাজেই নগরের ইংরেজী-না-জানা মুসলমান ও গঙ্গা-ভাগীরথীর মুসলিম মাঝি-মাল্লাদের মুখেই এক কালের বহুল-ব্যবহৃত জনপ্রিয় নাগরিক ভাষার সীমাবদ্ধ হয়ে থাকাই ছিল স্বাভাবিক।

(গ) ডক্টর আনিসুজ্জামান বলেছেন, "১৮৬০ বা ১৮৭০ খৃস্টাব্দ যাই বলি না কেন, তার আগে পর্যন্ত মুসলমানদের সৃষ্টির প্রধান মাধ্যম হচ্ছে মিশ্র-ভাষারীতির কাব্য।"—(পৃঃ ৪৪৭) ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ ধারণা ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা, ১৭৬০ থেকে ১৮০৫ সন অবধি আমরা মিশ্ররীতির কবি পাই মাত্র দু'জন—ফকির গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা এবং ১৮০৫ থেকে ১৮৭০ অবধি পাই জন আটেক শায়ের—মালে মুহম্মদ, মুহম্মদ খাতের, আবদুল মজিদ খান (উড়িষ্যাবাসী) মুহম্মদ দানিশ, জয়নুল আবেদিন, আরিফ, জনাব

আলি এবং সম্ভবত ঢাকার গরীবুল্লাহ বেপারী। মধ্যযুগীয় ধারায় এ সময়-কার বিশুদ্ধরীতির কবির সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী। আজো অমুদ্রিত বলে সেগুলো অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। অবশ্য মুদ্রিতাকারে দোভাষী পুথিই প্রচার পেয়েছে এবং সেকারণে প্রভাব রেখেছে বেশী।

(ঘ) লেখক বলেছেন, "পরবর্তী কালের সাহিত্যেও তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া বা ফারায়েজী আন্দোলনের প্রভাব বিশেষ দেখতে পাইনে।...তা যদি হতো তবে তিতুমীরের বিদ্রোহ নিয়ে কেউ না কেউ কিছু লিখতেন।" (পৃঃ ৪৪৮)। কেউ কিছু লিখেন নি, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা বোধহয় সঙ্গত নয়। ওহাবী-ফরায়েজী কিংবা তিতুমীরের আন্দোলন সম্পর্কে সে যুগে কিছু লেখা নিরাপদ ছিল না। কিছু লিখিত হলেও তা প্রচারের অভাবে লুপ্ত হয়েছে। মুদ্রিত কয়েকখানি পুথি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল বলে কবি আবদুল কাদির সূত্রে জানতে পাই। এ সময়ে নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত মুসলমানেরা সরকারের কোপদৃষ্টি এড়ানোর জন্যে সিপাহী বিপ্লব ও আন্দোলনের নিন্দা করে বিবৃতিও দিয়ে ছিলেন (পৃঃ ৬৬-৬৭)। এসব আন্দোলনের নিন্দা করে যেসব ছড়া, পদবন্ধ কিংবা গান-গাথা রচিত হয়েছিল, সেগুলো সরকারী প্রশ্রয়ে চালু ছিল তাই আজো অবিলুপ্ত (পৃঃ ১৬৭-৭২ এবং 'কাব্য-মালঞ্চ,' ভূমিকা)। তা ছাড়া কতক বাঙালী যখন ওহাবী-ফরায়েজী মত বরণ করেছে, সিপাহী বিপ্লবেও অংশ নিয়েছে, তখন এ সবের সমর্থনে কিছু না কিছু লিখিত হয়নি—এরূপ ধারণার অবকাশ সামান্য।

(ঙ) ডক্টর জামান লিখেছেন, "মুঘল আমলে ফারসী সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব বাংলা ভাষাও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এমন অনুমানের সুযোগ আছে।" (পৃঃ ৪৫৪)।—কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যের সাক্ষ্য এ অনুমানের প্রতিকূল। বাঙলায় মুঘল-বিজয় ঘটে চৈতন্যোত্তর যুগে। তখন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের যৌবনকাল। কাজেই রাজকীয় প্রতি-পোষণের প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গেছে। ফারসী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে তখন মুসলিম সমাজে সৃজনশীলতার বান ডাকে। কবির সংখ্যাধিক্যে, গ্রন্থের অনেকতায়, রচনার বিষয়-বৈচিত্র্যে ও ফারসী সাহিত্যের প্রভাবজ বর্ণনার ঔজ্জ্বল্যে সতেরো-আঠারো শতক মুসলিম-রচিত বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

দোভাষী-সাহিত্য সম্পর্কে লেখকের কয়েকটি মন্তব্য সদুক্তির মতো সুন্দর, প্রবচনের মতো সার্থক এবং আপ্তবাক্যের মতো সত্য।

১. লৌকিক ধর্মবিশ্বাস, তার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের আগ্রহ ও অতি প্রাকৃত ঘটনার বাহুল্যের দিক দিয়ে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যধারার [মিশ্ররীতির কাব্য ধারার] ঐক্য আছে। কিন্তু মঙ্গল কাব্যে দেব দেবীর তুলনায় মানুষের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতার যে স্বীকৃতি আছে এবং বাঙালী সংসারের হাসি-অশ্রু মিশ্রিত যে রূপটি সেখানে ধরা পড়েছে, সেই মানব স্বীকৃতি ও সমাজচিত্র এতে নেই।' (পৃ: ১৬১)

২. এই কল্পনার [দোভাষী কাব্যে রূপায়িত কল্পনার] পিছনে তো সুস্থ ও শিক্ষিত মনের অনুভূতি নেই—আছে অন্ধসংস্কার আর ভ্রান্ত বিশ্বাস। (পৃ: ১৬১)

৩. এক কথায়, মিশ্র ভাষা রীতির কাব্যকে আমরা ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি ধারার নিদর্শন বলে গণ্য করতে পারি—সমাজ জীবনের ক্ষয়ের চিহ্ন এতে স্পষ্ট। (পৃ: ১৬৩)

কিন্তু আলোচ্য সময়ে মফস্বল অঞ্চলে অবিমিশ্র ভাষায় রচিত অমুদ্রিত গ্রন্থ গুলো লেখকের আয়ত্তে ছিল না, তাই ছাপা কয়েকখানা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় গ্রন্থকারের দায়িত্ব শেষ হয়েছে। ব্যাপক ও ঘনিষ্ট পরিচয়ের অভাবে এগুলো সম্বন্ধে আলোচনা নিবিড় হতে পারেনি। তুলনায় দোভাষী-পুথি গুরুত্ব পেয়েছে বেশী।

উনিশ-বিশ শতকের মুসলিম লেখকদের অসম্পূর্ণ শিক্ষার কথা মনে জিইয়ে রেখে গ্রন্থকার তাঁদের সদিচ্ছার প্রতি একটু সহানুভূতি রাখতে পারতেন। তা হলে তাঁদের চিন্তার দৈন্য ও অসঙ্গতির দরুণ স্থানে স্থানে যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, তা হয়তো প্রশমিত থাকত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান আলোচ্য কালের মুসলমান লেখকদের চিন্তার দৈন্য ও অসামর্থ্যকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে করেছেন স্মরণ।

গ্রন্থ সূচী নিম্নরূপ :—অবতরণিকা, প্রথম ভাগ : দেশ ও কাল : ১ম অধ্যায় ১৭৫৭-১৮০০, ২য় অধ্যায় ১৮০১-৫৭, ৩য় অধ্যায় ১৮৫৮-১৯০৫, ৪র্থ অধ্যায় ১৯০৫-১৮। দ্বিতীয় ভাগ—সাহিত্য ও চিন্তাধারা ৫ম অধ্যায় মিশ্ররীতির কাব্য, ৬ষ্ঠ অধ্যায় : মধ্যযুগের অনুবৃত্তি ও আধুনিকতার সূচনা : ৭ম অধ্যায় : সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য, ৮ম অধ্যায় : তত্ত্ব ও তথ্য মূলক রচনা, নবম অধ্যায় সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য : ২য় পর্ব, ১০ম অধ্যায় উপসংহার। গ্রন্থপঞ্জী, নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়ের ৫ম পর্ব, ৩য় ও চতুর্থ অধ্যায় এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ষষ্ঠ পর্বের আলোচনা সুষ্ঠুতরো হয়েছে। এ গ্রন্থের একেক অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয় বা বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা ও অবদান আলোচিত হয়েছে। আলোচনার বিষয় বিন্যাস পর্বজ্ঞাপক সংখ্যায় চিহ্নিত। পর্ব শীর্ষে আলোচ্য বিষয়ের বা ব্যক্তির নাম নেই। বিষয় সূচিতেও আলোচ্য বিষয় সূত্র দেখা নেই। ফলে কোথায় কোন্ বিষয় বা ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে, তা খুঁজতে পাঠককে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের পরীক্ষা দিতে হয়। সময়ও নষ্ট হয় ঢের। এ এক দ্বারবিহীন ইমারত। নির্ঘণ্ট-নির্মাণেও রয়েছে অনবধানতা বা অবহেলা প্রসূত ত্রুটি তথা অসম্পূর্ণতা। গবেষণা গ্রন্থে এ ধরণের ত্রুটি উপক্ষেণীয় নয়। কেননা এতে বিদ্বানদের পক্ষে গ্রন্থের ব্যবহার কষ্ট-সাধ্য হয়ে ওঠে।

লেখক অনাসক্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এবং নিরপেক্ষ বিচারকের মন নিয়ে স্থিতধী বিশ্লেষকের দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গেই পালন করেছেন। সত্য-সন্ধ সুন্দর তাঁর মন, পরিচ্ছন্ন ও বিন্যস্ত তাঁর চিন্তা। এবং বাক্‌পটুতা, সুষম ও ঋজু প্রকাশভঙ্গি, বর্ণননৈপুণ্য আর রুচিশীলতা প্রভৃতি বিরল গুণও রয়েছে তাঁর। এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়ানো নানা মন্তব্য হাজারো চিন্তার উদ্রেক করে পাঠকমনে। এ গ্রন্থ কেবল লেখকেরই গৌরবের বস্তু নয়, পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্বানসমাজেরও গর্বের হেতু।

মুদ্রন প্রমাদ বিরল। প্রচ্ছদ সুন্দর ও উন্নত রুচির পরিচায়ক। মলাট শক্ত ও শোভন। কাগজ ভাল, মুদ্রন উজ্জ্বল। বাঁধাই মজবুত। মুদ্রক ও প্রকাশক ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থটি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে উৎসর্গিত।

—আহমদ শরীফ